ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের সূচনাও ঘটেছিল ব্রিটিশ আমলে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়। বাংলার নবজাগরণ যখন থেকে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন শিক্ষার দাবি, বিশেষ করে নারীশিক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে এবং জতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে দাবি উঠেছিল, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল মানবাধিকার আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারাটির সঙ্গে মিশেছিল মানবাধিকার আন্দোলনের ধারা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতা হল মানুষের অন্যতম মানবাধিকার। জাতীয় আন্দোলনের সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মাঝে মাঝেই মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য কংগ্রেস একটি অধিকার সম্বলিত ঘোষণা প্রস্তুত করে। বাক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, আইনানুগ বিচার পাওয়ার স্বাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য থেকে মুক্তি প্রভৃতি ছিল অধিকার সম্বলিত ঘোষণার মূল দাবি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সেই দাবি উপেক্ষা করেছিল। এরপর ১৯২৮ সালে মোতিলাল নেহেরু কমিটি ভারতীয়দের যেসব অধিকার দেওয়া হত না এরকম কিছু মৌলিক অধিকারের দাবি প্রস্তুত করে। ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে 'নিখিল ভারত নিপীড়িত রাজনৈতিক কর্মী দিবস' পালন করা হয়। হিজলী কারাগারের বন্দীদের ওপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে ১৯৩১ সালে কলকাতার মনুমেন্টের নীচে অনুষ্ঠিত হয় এক ঐতিহাসিক জনসভা। এতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ জনসভার মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি এবং নাগরিক স্বাধীনতার দাবিতে একটি 'নাগরিক কমিটি' গঠন করা হয়। তবে ঐ কমিটি সক্রিয়তার অভাবে ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ সালে করাচি কংগ্রেসেরও মৌলিক অধিকারের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৬ সালে নরেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে অবিভক্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বন্দীমুক্তি কমিটি। এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মৃণাল কান্তি বসু। ঐ বছরই জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে ভারতে প্রথম মানবাধিকার সংগঠনরূপে 'সারা ভারত পৌর স্বাধীনতা সংঘ' গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সংঘের প্রথম সভাপতি হন। ঐ সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন কে. বি. মেনন। জাতীয় নেতাদের একটি অংশ এই আন্দোলন যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশি অত্যাচার, রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর নিপীড়ন, রাজনৈতিক ও গণসংগঠনগুলির ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা, বিনা বিচারে আটক প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করা এবং গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঐ সংঘ ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯৪০ এর দশকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণেরও দাবি তোলা হয়।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মানবাধিকারের জন্য যে আন্দোলন হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে মিশে যায়। রাউলাট বিল বিরোধী আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ, সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ইত্যাদি ছিল একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলন। ১৯৩০ দশকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের অংশীদার ছিল না। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ঘটেছে তাতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল।[১৭] ১৯৩৮ সালে ও পরবর্তীকালে মানবাধিকার আন্দোলনের বিষয় ছিল বন্দীমুক্তি। বন্দীমুক্তি নিয়ে তখন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

---

১৭. বীরেন রায়, মানবাধিকার আন্দোলন, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার এর মধ্যে, পৃষ্ঠা ৯৬।

Scanned with CamScanner

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। যারা এতদিন ধরে সরকারের সমালোচনা করার, সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার দাবি করে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এবার দেশ শাসনের সুযোগ পেলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তিনি মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করার ব্যাপারে চূড়ান্ত নিস্পৃহতা দেখালেন। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, স্বাধীন ভারতের শাসকরা স্বাধীনতা উত্তর ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অগণতান্ত্রিক বিভিন্ন 'কালাকানুন' বা Black Act-এর ওপর কতটা নির্ভর করেছেন।

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ জুড়ে কমিউনিস্ট কর্মীদের ওপর চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান দমন করার তাগিদে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তীব্র রূপ নেয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, আইনজীবী শরৎচন্দ্র বোস, বুদ্ধিজীবী ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'সিভিল লিবার্টিস কমিটি' (Civil Liberties Committee) নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের ১৬ ও ১৭ জুলাই মাদ্রাজে নাগরিক অধিকার সম্মেলন (Civil Liberties

Scanned with CamScanner

Conference) অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবাসীর মধ্যে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এই সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সফল করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এ. কে. পিল্লাই, কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখ।

তারপর দীর্ঘদিন ভারতীয়দের তরফ থেকে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই সময় রাষ্ট্রীয় নীতি যখন মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে, প্রতিবাদ উঠে এসেছিল মূলত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি থেকে।

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। এই অভ্যুত্থানের ঢেউ নানাস্তরের মানুষকে স্পর্শ করেছিল। শুরু হয়েছিল ছাত্র ও যুবকদের প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিদ্রোহ। নকশালপন্থীদের দমন করার জন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মারাত্মক হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গে। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা, বেআইনি আটক, জেলখানায় নিরস্ত্র রাজবন্দিদের ওপর আক্রমণ ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিনগুলিতে দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন প্রমোদ সেনগুপ্ত, কপিল ভট্টাচার্য, ড. অমিয় বোস প্রমুখ বিবেকবান মানুষ। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ২৫ জুন জন্ম নেয় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ও সবচেয়ে সক্রিয় মানবাধিকার সংগঠন 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি' বা Association for Protection of Democratic Rights (APDR)।

নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের অনুসরণে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম অঞ্চলেও শুরু হয় জঙ্গি কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে অন্ধ্রের গণআন্দোলনও তীব্র রূপ নিয়েছিল। গণআন্দোলন দমন করার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশেও নেমে এসেছিল নিষ্ঠুর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'অন্ধ্রপ্রদেশ সিভিল লিবার্টিস কমিটি' নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৭৪ সালে। শ্রী শ্রী, চেরবান্দা রাজু প্রভৃতি প্রগতিশীল তেলেগু সাহিত্যিকরা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। জরুরি অবস্থার সময় একাধিক রাজনৈতিক সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়, সভা-সমিতি করার অধিকার হরণ করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়, প্রশাসনের তরফে বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং

Scanned with CamScanner

শাসকদলের বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী বহু নাগরিককে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ নাগরিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেন। গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনকারী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জরুরি অবস্থার সময় জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। আর এই সময় প্রতিবাদী মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এ.পি.ডি. আর.। ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট সরকার এ.পি.ডি.আর.-কে বেআইনি সংগঠন হিসাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও সমিতি গোপনে *ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ* নামে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ভূমিকার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। আজও পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি একটি অত্যন্ত সক্রিয় সংগঠন। রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর আক্রমণ, বন্দিদের ওপর দৈহিক অত্যাচার, পুলিশ হেফাজতে বা জেলে মৃত্যু, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যে কোনো ঘটনার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে অগ্রণী ভূমিকা নেয় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি। সাম্প্রতিক অতীতে গড়ে ওঠা আর একটি মানবাধিকার সংগঠন 'মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ'ও পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে সক্রিয় হয়েছে।

Scanned with CamScanner

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাধান্য বিস্তারকারী দলব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু মানবাধিকার লঙঘনের ব্যাপারে বামপন্থী দলগুলির এযাবৎকালে যে সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তারা অনেকটা নিস্পৃহ হয়ে থাকে।[১৮] বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের নামে বহু ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তার ফলে ভারতীয় জনগণের মানবাধিকার বিপন্ন হয়ে পড়ছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার রক্ষা কমিটি ও ফোরামগুলি অভিযোগ তুলেছে। তবে একথাও ঠিক যে ভারতের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপও মানবাধিকারের পরিপন্থী। সাম্প্রতিক্কালে নারীবাদীরা নারীদের স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে তুলেছেন। ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তফশিলী জাতি ও উপজাতিগুলিও বর্তমানে তাদের অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছে। মানবাধিকার আন্দোলনকে সফল করে তুলতে গেলে সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে এবং তাদের এই আন্দোলনে টেনে আনতে হবে।

Scanned with CamScanner